গুজরাট ফাইলস

এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের ময়নাতদন্ত

মূল: রানা আইয়ুব

ভাষান্তর: সুমন দত্ত
সম্পাদনা: টিম প্রজন্ম

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
facebook.com/projonmopublication
www.projonmo.pub

গুজরাট ফাইলস

এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের ময়নাতদন্ত

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০১৯

প্রচ্ছদ
ওয়াহিদ তুষার

ফটোগ্রাফী
অনামিকা ভার্মা

পরিবেশক
আমাদেরবই ডট কম
০১৯৫৪ ০১৪ ৭২০

অনলাইন পরিবেশক

Rokomari.com	AmaderBoi.com	islamiboi.net
Boibazar.com	Ruhamashop.com	Wafilife.com
Eksathei.com	Alfurqanshop.com	Sijdah.com
Shobdaloy.com	Islamicboighor.com	Boipark.com
Pothikshop.com	Niyamahshop.com	Kitabghor.com
Tariqzone.com	Boisomahar.com	Ittadishop.com

মূল্যঃ ৩০০ [তিনশত] টাকা

Gujrat Files by Rana Ayyub, Translated by Sumon Datta, Edited by Team Projonmo, Published by Projonmo Publication
Copyright © Rana Ayyub
Price: 300 Taka , 10 US$
ISBN: 978-984-34-6700-3

মুকুল শর্মা ও শাহিদ আজমি'র

স্মৃতিতে উৎসর্গ করলাম

যারা আমাকে লড়াই করার প্রেরণা জুগিয়েছে।

আব্বা আর আম্মার জন্য

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি ০৯
ভূমিকা ১১
মুখবন্ধ ১৩
প্রথম পরিচ্ছেদ ১৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৪৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৬১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৭৭
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৮৫
সপ্তম পরিচ্ছেদ ১১১
অষ্টম পরিচ্ছেদ ১২৬
নবম পরিচ্ছেদ ১৪৫
দশম পরিচ্ছেদ ১৫৮
একাদশ পরিচ্ছেদ ১৯১
পাদটীকা ১৯৫

লেখক পরিচিতি

রানা আইয়ুব ১৯৮৪ সালের পহেলা মে ভারতের মুম্বাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯২-৯৩ এ দাঙ্গার সময় তাঁর পরিবার শহর ছেড়ে মুসলিম প্রধান অঞ্চল দেওনার এ চলে যায়। রানা এই শহরেই বেড়ে ওঠেন। দিল্লির জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মিডিয়া ও জার্নালিজম' এ স্নাতকোত্তর সম্পূর্ন করে সাংবাদিকতা শুরু করেন।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় আগ্রহ থেকে নামকরা ম্যাগাজিন *'তেহেলকা'*য় যোগ দেন রানা। ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে *তেহেলকা*'র প্রধান সম্পাদক তরুণ তেজপালের বিরুদ্ধে একজন অধঃস্তন কর্মী যৌন হয়রানির অভিযোগ করে। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে *তেহেলকা* কর্তৃপক্ষের অসন্তোষজনক প্রতিক্রিয়ার প্রতিবাদে তিনি প্রতিষ্ঠানটি ত্যাগ করেন।

বর্তমানে রানা আইয়ুব ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে কাজ করছেন। *আল জাজিরা*, *ওয়াশিংটন পোস্ট*, *নিউ ইয়র্ক টাইমস*, *গার্ডিয়ান*, *ফরেন পলিসি* সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে নিয়মিত লিখছেন তিনি।

২০১০ সালে 'দেশভাগের পর ভারতের শীর্ষ প্রভাবশালী ৫০ মুসলিম' এর তালিকায় উঠে আসে রানার নাম। ২০১১ সালে তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ 'সংস্কৃতি' অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। ২০১৬ সালে 'এমএম জার্নালিস্ট অব দ্য ইয়ার' অ্যাওয়ার্ড, ২০১৭ সালে 'গ্লোবাল শাইনিং লাইট' অ্যাওয়ার্ড এবং ২০১৮ সালে রানা 'মোস্ট রিজিয়েলেন্ট গ্লোবাল জার্নালিস্ট' অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন রানা আইয়ুব।

ভূমিকা

সত্যের মুখ আবৃত আছে সোনার পাত্রে;
হে পূষণ, সত্যময় ধর্মের দর্শনের জন্য তা অনাবৃত করো...
- ঈশভাষ্যোপনিষদ

'গল্পকাহিনীর চেয়ে সত্য বিচিত্রতর, কারন গল্পকাহিনীকে কিছু সম্ভাবনার মধ্যে আটকে থাকতে হয়। এতে সত্যের কোন লেশ নেই' এই কথাটি বিদ্রুপ করে বলেছিলেন মার্কিন রম্য লেখক মার্ক টোয়েন। সত্যকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখেছেন খ্রীষ্টের রক্ত ধরা থালার মতোই। কেননা সত্যকে একাগ্রচিত্তে খুঁজতে চাইলে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাময় নিঃসঙ্গ পথ ধরেই চলতে হবে। পথ দেখানোর জন্য থাকবে শুধু নিজের বিবেক। কারও কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে না। এই সত্যের প্রকৃতি কী সে-প্রশ্ন সারা পৃথিবীর দার্শনিকদের ভাবিয়ে তুলেছে বহু যুগ ধরে।

এই বই থেকে পাঠক জানতে পারবেন ২০০২ সালে গুজরাটের মর্মান্তিক ঘটনা এবং সাজানো বন্দুকযুদ্ধের কল্পকাহিনি সম্পর্কে। লেখিকার মতে, এক দীর্ঘ স্টিং অপারেশনের সময় বহুল-ব্যবহৃত একটি গোপন ক্যামেরা ও গোপন মাইক্রোফোনের সূত্রে প্রাপ্ত বিষয়গুলি জানতে পারবেন। এই বইতে উপস্থাপিত বিষয়গুলি সত্য নাকি নিছকই ঘটনার রূপমাত্র তা বিচার করবেন পাঠক মহল।

ঘটনার বিবরণের মধ্যে লিখিত কথোপকথনগুলি পড়তে চমৎকার লাগে। রাষ্ট্রের কর্তব্য এই বইতে বর্ণিত তথ্যগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করে আইনের শাসনের প্রতি দেশের নাগরিকদের আস্থা পূনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এবং আপন প্রহরী হিসেবে আইনের শাসন ও সাংবিধানিক কাঠামোকে ব্যবহার করা।

মুম্বাইয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হিংসাত্মক ঘটনাগুলি ঘটেছিল ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত। দাঙ্গা সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সূত্রে অর্জিত যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা এবং এই ধরনের দাঙ্গার শিকারদের প্রতি চরম উদাসীনতা দেখে মনে হয়, এখনই এইসব দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধানে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। এই ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক কর্মকর্তাদের।

এই বইয়ে বর্ণিত সমস্ত তথ্য সঠিক কিনা তাঁর মূল্যায়ন করা হয়তো সবার পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু সত্য উন্মোচনে লেখিকার সৎ সাহস ও প্রচেষ্ঠার প্রশংসা করতে সকলেই বাধ্য হবেন। ক্রমবর্ধমান অসততা, প্রতারণা ও রাজনীতিকীকরণের এই যুগে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই বেড়ে উঠেছে। এ ধরনের সাংবাদিকতায় লেখিকার সাহসী প্রচেষ্টাকে আমি সম্মান জানাই।

বি.এন.শ্রীকৃষ্ণ
মুম্বাই
১১ এপ্রিল, ২০১৬

মুখবন্ধ

ক্ষমতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম হচ্ছে
বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মৃতির সংগ্রাম।
- মিলান কুন্দেরা

২০০৭ সালে তিন বছরের একটি বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করা নিয়ে একটি নিউজ চ্যানেলের জন্য করা রিপোর্টটি আমার জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গিয়ে তরতাজা স্মৃতি হয়ে রয়ে গেছে। মিউনিসিপ্যাল হাসতাপালে ভর্তি ছিল মেয়েটি। মেয়েটির বাবা-মা একটা ট্রাফিক সিগন্যালে চোরাই বইপত্র বিক্রি করতেন। মাদকের ভয়াল নেশায় আচ্ছন্ন থাকার দরুন নিজেদের পাঁচ মেয়ের একজনের যন্ত্রণা ও দুর্দশা বুঝে ওঠার অবস্থায় ছিলেন না তাঁরা। মেয়েটির মুখে আর শরীরে ছিল প্রহারজনিত কালশিটের দাগ। ছোট্ট সেই নিষ্পাপ শরীরের সর্বত্র বর্বরতার চিহ্ন আঁকা। রিপোর্টের টেপটা দিল্লির স্টুডিওতে পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত দুইটা বেজে গেল। মনে হল ধর্ষকটি ধরা পড়েছে কিনা তাঁর খোঁজ নেওয়ার জন্য ওই মাঝরাতেই তদন্তকারী অফিসারকে মেসেজ পাঠানো দরকার। মেয়েটির অবস্থা জানার জন্য পরের দিন হাসপাতালে গেলাম। নানা রকম সংক্রমণ ঘটেছে ছোট মেয়েটির শরীরে। ক্ষতস্থানে মাছি বসছে, ছোট্ট কবজিতে ছুঁচ ফোটানো রয়েছে। এবারও আশেপাশে তাঁর মা-বাবাকে চোখে পড়ল না। অফিসে পৌঁছে আমার বসকে বললাম এই বিষয়টায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া দরকার, যাতে অপরাধী ধরা পড়ে এবং বিচার হয়। আমার কথা শুনে একটু হেসে নিজের ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। আমার বস বললেন, এর বদলে আমি যেন মিলান সাবওয়ে আর বৃষ্টির দিকে মন দিই এবং বন্যার কিছু ভালো ছবি জোগাড় করি।

'আমার পক্ষে সম্ভব নয়', মিলান সাবওয়ের দিকে যাওয়ার পথে মাকে ফোন করে চেঁচিয়ে বললাম আমি। মুম্বাইয়ের বিখ্যাত বর্ষার মরশুমে

মিলান সাবওয়ে আলোকচিত্রীদের খুব প্রিয় হয়ে ওঠে। বসের সাথে কথার পর থেকে বুক ধরফর করছিল। সারাদিন কিছু খেতে পারলাম না। ঘটনার তিন দিন পর পারিবারিক চিকিৎসক আমাকে ঘুমের ওষুধ দিলেন। সম্পাদককে ফোন করে বললাম, আমার এক সপ্তাহ ছুটি চাই। ছোট্ট মেয়েটির ঘটনার আগে স্টুডেন্টস্ ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (সিমি) সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের কাজ করছিলাম আমি। কাজটা করার সময় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নীতিবোধ নিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে ব্যাপক তর্ক হয়েছিল। আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনে তিনি এমন কিছু বলেছিলেন, যা আমি আজও ভুলতে পারিনি।

একজন ভালো সাংবাদিকের একটি কৌশল আয়ত্ত করা দরকার সেটি হলো যে-বিষয় নিয়ে কাজ করা হচ্ছে তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। একই সাথে তাকে বাস্তববাদী হতে হবে। আমার আজও দুঃখ হয় কারণ এই কৌশলগুলি আয়ত্ত করে উঠতে পারি নি। এই কৌশল প্রায়শই ব্যবহৃত হয় বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলির নির্দেশে কোন ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার অজুহাত হিসেবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

২০১০-এর গ্রীষ্মকালটা আমার জন্য সাংবাদিকতার নতুন সংজ্ঞা ঠিক করে দিল। নিজেকে একজন পরিশ্রমী, মধ্যমেধার সাংবাদিকই মনে করতাম আমি, যে তাঁর পুরোনো দিনের সাংবাদিক পিতার কাছ থেকে কিছু আদর্শ পেয়েছে। কিন্তু ওই সময়ে নিজেকে এমন এক সংকটের মুখোমুখি দেখতে পেলাম, প্রার্থনা করি তেমন সংকটে যেন কোনো সাংবাদিককে কখনো পড়তে না হয়।

অসুস্থতাজনিত দীর্ঘ ছুটির পর আবার *তেহেলকা*-র কাজে যোগ দিয়েছি ২০১০ সালের কোনো এক সময়ে। চিকিৎসকরা সঠিকভাবে আমার রোগনির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। গড়চিরোলির নকশালপন্থী কার্যকলাপের কেন্দ্রভূমিতে একটা রিপোর্টিংয়ের কাজ সেরে ফিরেছি। তাঁর ঠিক পর পরই ঘটল আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক ও মর্মান্তিক একটি ঘটনা। হঠাৎ খুন হয়ে গেল আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু শাহিদ আজমি। সে ছিল ফৌজদারি আইনে দেশের সবথেকে বিচক্ষণ আইনজীবিদের একজন। আমার জীবনে আজমি'র ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেদিন সন্ধ্যায় আজমি খুন হয়, সেদিনই ওর সঙ্গে আমার দেখা করার কথা ছিল। সেইসব আদিবাসী ও বুদ্ধিজীবীদের মামলা নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল তাঁর সাথে, যাদের নকশাল নামে চিহ্নিত করে মিথ্যে মামলায় জেলে ঢুকিয়েছে সরকার।

আজমি'র সাথে সাক্ষাতের পরিকল্পনা থাকলেও ভাগ্য আমাকে তাঁর কাছ থেকে দূরে রাখলো। ভাইঝির সতেরোতম জন্মদিনে ওর আবদার রক্ষার্থে বাড়িতেই থেকে যেতে হল আমাকে। কয়েক ডজন মিসড কল এসেছে আমার ফোনে, মেসেজ পাঠিয়ে অনেকে জানতে চেয়েছে 'শাহিদের ব্যাপারে শেষ খবর' আমি জানি কিনা। আসলে এগুলো আমি পরে দেখেছিলাম। বন্ধুদের লাগাতার ফোনে এবং নিউজ চ্যানেলগুলোর ব্রেকিং নিউজ থেকে বাকিটুকু জানলাম। 'জাতীয়তা বিরোধী' ব্যক্তিদের মামলা হাতে নেওয়ায় শহিদকে তাঁর নিজ অফিসেই অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীরা

গুলি করে হত্যা করেছে। কিছুদিন আগেই ৭/১১-র মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণের নিরপরাধ অভিযুক্তরা মুক্তি পেয়েছিল শাহিদের প্রশ্নের জোরেই। ওর মৃত্যুর পর ২৬/১১-র মুম্বাই হামলার দু'জন অভিযুক্তকে মুক্তি দেয় মুম্বাই কোর্ট। শাহিদের হত্যার পিছনে মূল হোতা কে তা আজও রহস্য রয়ে গেছে, অন্তত সাধারণ মানুষের কাছে।

শাহিদের মৃত্যুর তিনদিন পর নাগপুর যাচ্ছিলাম। যে জন্য যাচ্ছিলাম সেটা আমার সাংবাদিক জীবনের একটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে চলেছিল। কোন ক্ষতি মোকাবিলার অনেক উপায় আছে। কেউ একটানা বিলাপ করে চলতে পারে। কেউ-বা মুখ ফিরিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে শান্তনা খোঁজে। আমি দ্বিতীয় পন্থাটাই বেছে নিয়েছিলাম। নাগপুরের কাজটা ছিল নকশালপন্থী হিসেবে অভিযুক্ত ছাত্রদের গ্রেপ্তার সংক্রান্ত, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল অনুন্নত শ্রেণির। তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলো ছিল নিতান্তই হাস্যকর। তাদের কাছে ভগৎ সিং এবং চন্দ্রশেখর আজাদের লেখাপত্র পাওয়া গেছে বলে দাবি করা হলো। কাজটা যেন আমার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল, কেননা এই ধরনের মামলা লড়তে গিয়েই আমার বন্ধু শাহিদ জীবন দিয়েছে। এটা যেন অনেকটা তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন।

কিন্তু ভাগ্যের লিখন না যায় খণ্ডন। এক দুর্বোধ্য অসুস্থতা নিয়ে আবার বাড়ি ফিরতে হল আমাকে।

বাড়ি পৌছে আমার চিকিৎসা চলতে থাকলো। আমার ব্যাকুল বাবা-মা চিকিৎসার কোন কমতি করলেন না। ব্রঙ্কোস্কোপি থেকে এমআরআই পর্যন্ত কিছুই বাদ যায়নি। একজন চিকিৎসক বলেন আমার যক্ষ্মা হয়েছে, আমার বাবা-মার উচিত আমাকে ধ্যানের অভ্যাস করানো। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সাউথ বম্বে হাসপাতালে মুম্বাইয়ের খুব ভালো একজন চিকিৎসক আমাকে পরীক্ষা করেন। রিপোর্টগুলো দেখে ডা. চিটনিস কিছু প্রশ্ন করেন আমাকে। তারপর বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন বিষয়টা সারাক্ষণ ভাবিয়ে চলেছে আপনাকে?' প্রশ্নটা শুনে যেন আচমকা ঘুম থেকে থেকে জেগে উঠলাম আমি। শান্তভাবে বললাম 'কিছুই না ডাক্তারসাহেব।

আসলে আমি বড্ড ক্লান্ত, খুব দুর্বল লাগছে, কোথায় যে কী হচ্ছে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

আমার কথা শুনে ডাক্তার একটু মুচকি হেসে বললেন, 'নিজেকে এইরকম দুঃখী-দুঃখী বানিয়ে রাখাটা আপনাকে কিন্তু ছাড়তে হবে। এইসব রক্ত পরীক্ষা-টরিক্ষা করিয়ে নিজের দুঃখ বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনি একদম সুস্থ আছেন। সবটাই আপনার মনের ব্যাপার।' কাজে যোগ দিন, কাজই আপনার ঔষধ।

নিজের অবস্থা যাচাই করার চেষ্টা করতে গিয়ে কয়েকদিন আগে একটা শব্দ শিখেছিলাম 'হাইপোকনড্রিয়া'। আজ মনের অজান্তেই মুখ থেকে উচ্চারিত হলো 'হাইপোকনড্রিয়া?' শব্দটি শুনে ডা. চিটনিস শান্ত সুরে বললেন, 'না। আপনি স্রেফ অলস হয়ে পড়েছেন আর নিজের উপর অর্পিত দায়দায়িত্ব থেকে পালাতে চাইছেন।'

আমি যখন ডা. চিটনিসের উপদেশগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলাম ঠিক সেই সময়ে আমার একাকীত্বের বন্ধু হিসাবে আমার মা এগিয়ে এলেন। মা আমার সবচেয়ে প্রিয় ও বিশ্বস্ত বন্ধু। আমার মা একজন সহজ সরল মানুষ। তিনি কোনোদিন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিতা হননি। আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাই ছিলেন তাঁর গৃহশিক্ষক। আম্মা বলতেন, নিজের স্বপ্নগুলো আমাকে দিয়ে পূরণ করতে চান তিনি। তাঁর স্বপ্নের কথাগুলো শুনে আমি বেঁকে বসতাম। তবুও আম্মা হাল ছাড়তেন না, আশকারা দিতেন, শেষমেষ বাড়ির সবাই এসে জড়ো হতো। সেদিন আমাকে কফি দিয়ে আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে কি চাকরিটা ছেড়েই দিচ্ছিস?'

একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে কফির কাপটার দিকেই মন দিলাম। বরাবরের মতোই আম্মা আমার বিছানায় পাশে বসে 'ইনকিলাব' (বিশিষ্ট উর্দু সংবাদপত্র) পড়তে শুরু করলেন তিনি। মিনিট দশেক পড়ার পর সবে আমাকে কিছু বলতে যাবেন, মাঝপথেই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'আম্মা, আমাকে আর কাগজের উপদেশ দিতে হবে না, কাগজ-না পড়েই আমি ভালো আছি।'

'আরে না। তুই কি সোহরাব উদ্দিনের ঘটনাটা পড়েছিস?' আম্মা বললেন। নামটা শুনেই আমার কৌতুহল বেড়ে গেল। এই সময়ের সবথেকে বিতর্কিত ব্যক্তিদের অন্যতম নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা হয় আমার সোহরাব উদ্দিনের সূত্র ধরেই। তাই তাকে আমি ভালো করেই জানি।

সাজানো বন্দুকযুদ্ধে পাতি জুয়াচোর সোহরাব উদ্দিনকে হত্যাকারী তিন পুলিশ কর্মকর্তা নিজেদেরই একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী রজনীশ রাইয়ের হাতে **গ্রেপ্তার** হয়ে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিলেন। জেলে যেতে হয়েছিল ডি.জি. বানজারা আর রাজকুমার পান্ডিয়ানকে। তাঁরা ছিলেন মোদি সরকারের সবথেকে বিশ্বস্ত অফিসার। অত্যন্ত প্রতাপশালী এই অফিসাররা গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সারা দেশের নজর আকৃষ্ট হয়েছিল এই খবরের দিকে। কাগজে প্রতিদিন তাঁদের সাংবাদিক সম্মেলনের ছবি বেরোত। ২০০৪ সালে জিহাদিরা যখন 'হিন্দু হৃদয়সম্রাট' নরেন্দ্র মোদিকে হত্যা করতে যাচ্ছিল, তখন এই অফিসাররাই তাদের খুঁজে বের করে হত্যা করেছিলেন।

একটি টেলিভিশন নিউজ চ্যানেলে রাজনৈতিক প্রতিবেদক হিসেবে যোগদান করি ২০০৭ সালে। আমার প্রথম কাজটা ছিল গুজরাটের নির্বাচন সংক্রান্ত রিপোর্টিং করা। ২০০২ সালের গুজরাটের দাঙ্গা সমাজকে স্পষ্টতই বিভক্ত করে দিয়েছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কাছে নায়কে পরিণত হয়েছিল মোদি। ২০০৭ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়লাভ করা তাঁর পক্ষে খুব কঠিন ছিল না। অধিকাংশ বিশ্লেষকই বলেছিলেন, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আবার নিরঙ্কুশভাবে জিততে চলেছেন।

একজন ক্যামেরাম্যান সাথে নিয়ে তাঁর প্রথম নির্বাচনী সমাবেশে গেলাম। ঠিক মনে নেই, তবে সম্ভববত এই সমাবেশের উদ্যোক্তা ছিল গুজরাট চেম্বার অফ কমার্স। মঞ্চে বসে ছিলেন নরেন্দ্র মোদি, পাশে তাঁর ডান হাত অমিত শাহ। অন্য কিছু মন্ত্রীও ছিলেন। এর আগে অন্যান্য রাজনৈতিক সমাবেশ কভার করেছি আমি। প্রথমটায় এই সমাবেশকেও সেগুলোর থেকে আলাদা মনে হচ্ছিল না। তবে আমার দিল্লির প্রযোজকরা আগেই বলে দিয়েছিলেন, মোদির প্ররোচণামূলক বক্তৃতা দেওয়ার একটা ক্ষমতা

আছে। সেদিনও হতাশ করলেন না। মোদি শুরু করলেন, 'সোহরাব উদ্দিন, ওরা জিজ্ঞেস করছে সোহরাব উদ্দিনের মতো একজন সন্ত্রাসীর ব্যাপারে কী করেছি আমি।' জনতা উল্লাসধ্বনি করে উঠল। মহিলারা হাততালি দিলেন। সামনের সারিটা সর্বদাই মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকত, কেননা মনে করা হত গুজরাটের মহিলাদের মধ্যে মোদি অত্যন্ত জনপ্রিয়। কলামিস্ট আকর প্যাটেল তো একটা কলামে এমনও লিখেছিলেন যে, গুজরাটি মহিলাদের কাছে মোদি হচ্ছেন সেক্স সিম্বল।

জনতার মধ্যে থেকে প্রত্যাশিত ভাবেই আওয়াজ উঠছিল, 'মেরে ফেলো, মেরে ফেলো।' আমার মনে হচ্ছিল যেন কোনো রোমান এ্যাম্ফিথিয়েটারে বসে আছি। 'মিঁয়া মোশারফ' আর 'দিল্লি কা সালতানাত'- এর মতো নানান কুৎসিত মন্তব্য সহকারে ভাষণ চলতে লাগল। ভাষণ শেষ করে মোদি যখন মঞ্চ থেকে নামলো তখন তাঁকে মালা পরালেন গুজরাটের চেম্বার অফ কমার্সের সদস্যরা। তাঁর চারপাশে মানুষের ভিড়, নিরাপত্তারক্ষীদের টপকে ঠেলেঠুলে এগোতে এগোতে আমার ক্যামেরাম্যানকে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম। আমার পিছনে আসার জন্য রীতিমতো ধস্তাধস্তি করতে হচ্ছিল তাকে।

ভীড় ঠেলে যখন মোদীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম 'মোদিজি, মোদিজি, একটা প্রশ্ন ছিল।' ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, অনুরাগী ও সঙ্গীসাথীতে পরিবৃত মানুষটি ফিরে তাকালেন আমার দিকে, সম্ভবত কোন রাজনৈতিক প্রশ্নই প্রত্যাশা করেছিলেন। 'মোদিজি, গুজরাটে সাজানো বন্দুকযুদ্ধে সোহরাব উদ্দিনকে হত্যার অভিযোগে তিনজন অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর পরেও কি আপনি বলবেন, বক্তৃতায় আপনি যা-কিছু বললেন সবই সঠিক?' উত্তর পাওয়ার জন্য মাইকটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। পুরো ১০ সেকেন্ড আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে উত্তর না দিয়ে ফিরে চলে গেলেন নরেন্দ্র মোদি। আমার দিকে ঘৃণার চোখে তাকালেন তাঁর মন্ত্রী। দেশের সবথেকে লোভনীয় পদ অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর আসনে বর্তমানে অধিষ্ঠিত মানুষটির সঙ্গে এটাই ছিল আমার প্রথম দেখা।

সোহরাব উদ্দিনের ঘটনা অবশ্যই প্রকাশ্যে আসা উচিত। আম্মার 'ইনকিলাব' পড়ার সূত্রে সুযোগটা এসে গেল আমার কাছে। বিবেকের তাড়নায় চলে গেলাম সেখানকার এক সাইবার ক্যাফেতে।

সোহরাব উদ্দিন সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ থেকে জানা গেল, সিবিআই এ-ব্যাপারে তদন্ত করেছে এবং গুজরাটের একজন শীর্ষস্থানীয় আইপিএস অফিসার অভয় সুদাসামা গ্রেপ্তার হয়েছেন। সুদাসামাকে আমি চিনতাম। মাত্র একবছর আগেই গুজরাট বিস্ফোরণ মামলায় তাঁর এক প্রধান স্বাক্ষীর স্বীকারোক্তি আমি প্রকাশ করেছিলাম। তখন টেলিফোনে আমাকে হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। গুজরাট বিস্ফোরণের তদন্তের মূল দায়িত্বে ছিলেন সুদাসামা, যে-বিস্ফোরণের সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন' নামক গ্রুপটি যুক্ত ছিল। রাজ্যের সবথেকে স্পষ্টবাদী ও মিডিয়া ঘনিষ্ঠ অফিসারদের অন্যতম একজন ছিলেন সুদাসামা। জনশ্রুতি আছে, তিনি গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তবে খ্যাতিমান হয়ে ওঠা অন্যদের থেকে আলাদা ছিলেন সুদাসামা। চোর-জোচ্চোর ও হাওলা সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন তিনি। সোহরাব উদ্দিন তাঁর সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

এই ঘটনা সম্পর্কে যাবতীয় প্রিন্টআউট আর নোট তৈরি করে এটি নিয়ে লেখালেখির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দিল্লিতে আমার দুই সম্পাদক সোমা চৌধুরি ও তরুণ তেজপালের কাছে একটা চিঠি পাঠালাম। আমি জানতাম, আমার স্ব-আরোপিত বিচ্ছিন্নতা ও অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসার এটাই একমাত্র উপায়। দুই সম্পাদকই প্রচুর উৎসাহ দিলেন। আবার আহমেদাবাদ রওনা দিলাম আমি। এই আহমেদাবাদ যাত্রা আমার জীবন পাল্টে দিয়েছিল।

আহমেদাবাদ যাওয়ার প্রায় একমাসের মধ্যেই দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা মিডিয়ায় প্রকাশ আমি। কয়েকজন অফিসারের সাহায্যে কলরেকর্ড আর বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ নোট ঘেঁটেই কাজটা করতে পেরেছিলাম। এই অফিসারদের নাম আমি উল্লেখ করব না। খুব সতর্কভাবে তাঁদের সাহায্য চাই, জানতাম তাঁরাই আমার একমাত্র আশা। কিন্তু গুজরাটের মতো

একটা রাজ্যে বিশ্বাস অর্জন করা আদৌ সহজ নয় কারন সেখানে কর্তব্যনিষ্ঠ অফিসারদের সরকারের রোষের শিকার হতে হয়। তাছাড়া এঁদের মধ্যে বেশিরভাগ সেই প্রথম দেখলেন আমাকে। আমি *তেহেলকার*'র সাংবাদিক বিষয়টা একারনে আরও জটিল ছিল। যেহেতু আমি *তেহেলকার*'র সাংবাদিক অর্থাৎ যে-কোন সময় আমার কাছে একটা স্টিং ক্যামেরা থাকতেই পারে।

গুজরাটে আমি যে বিষয়টার মুখোমুখি হয়েছিলাম, তা শুধু গুজরাটকেন্দ্রিক বিষয় ছিল না। সৎ পুলিশ অফিসারদের নামে মামলা রুজু করে হেনস্থা করাটা উত্তরপ্রদেশ আর মণিপুরেও একেবারে পানিভাত হয়ে উঠেছে- এই দুটি রাজ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত রিপোর্টিং করেছি আমি। এটাও বুঝেছিলাম যে এই হেনস্থা করার ব্যাপারটাই আমার রক্ষাকর্তা হয়ে উঠবে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য যে অফিসার জানিয়েছেন, দেখা গেল তিনি আসলে এমন কোনো অফিসারের সহপাঠী ছিলেন, যাঁর সম্বন্ধে কিছু রিপোর্ট করেছি আমি। এভাবেই বরফ গললো। মানবাধিকার কর্মী ও তথ্য-জোগানো অফিসারদের সহায়তায় বছরের সবথেকে চাঞ্চল্যকর একটা ঘটনা ফাঁস করতে সক্ষম হলাম আমি। এটা ছিল সংঘর্ষ চলাকালীন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে উচ্চপদস্থ অফিসারদের ফোনে কথাবার্তার কলরেকর্ড ও অভ্যন্তরীণ 'অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট' সংক্রান্ত একটা অত্যন্ত নিন্দাজনক নোট। মন্ত্রীর কার্যকলাপের দিকে নজর রেখেছিল সিআইডি। ফাঁস করা সেই নোটে বলা হয়েছিল, সংঘর্ষ হচ্ছে নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করার ও তাদের সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার মাধ্যম।

এই চাঞ্চল্যকর রিপোর্টটি রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন তুলল। সিবিআই থেকে *তেহেলকা*'র দপ্তরে বারবার ফোন করে বলা হলো কলরেকর্ডগুলো তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। পরে সুপ্রিম কোর্টের সামনে রেকর্ডগুলো পেশ করা হয়েছিল। আহমেদাবাদের হোটেল এ্যাম্বাসাডরেই তখনও থাকছিলাম আমি। হোটেলটা ততদিনে আমার দ্বিতীয় বাড়ি হয়ে উঠেছিল। মূলত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা খানপুরে অবস্থিত এই

হোটেলটা আমার পক্ষে যথেষ্ঠ সুবিধাজনক ছিল। পরে জেনেছিলাম ওখান থেকে মাত্র কয়েকটা ব্লক পরেই ছিল রাজ্য বিজেপি-র সদর দপ্তর। রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর হঠাৎই সবার নজর এসে পড়ল আমার ওপর। বিজেপি নেতারা বলতে লাগলেন, আইয়ূব নামে একজন অল্পবয়সী ছোকরাই এইসব তথ্য ফাঁস করেছে। যে-কোন কারণেই হোক তাঁদের মাথায় আসেনি যে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকটি কোনো মেয়েও হতে পারে। এতে আমার আরো সুবিধা হলো, এর ফলে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারছিলাম। তবে এই সুবিধাটা বেশিদিন রইল না। রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিন পরে অজানা নম্বর থেকে একটা মেসেজ এল আমার ফোনে, 'আমরা জানি তুমি কোথায় আছ।'

এবার জীবন সত্যিই পাল্টে গেল। সেইদিন থেকে শুরু করে তিনদিন পরপর বাসস্থান পাল্টাতে লাগলাম; আহমেদাবাদের আইআইএম ক্যাম্পাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন গেস্টহাউস, হোস্টেল আর জিমখানায়। পলাতকের মতো জীবন। এই সময় মোবাইল ফোনের বদলে ল্যান্ডলাইন ব্যবহার করতে শুরু করি। অবশেষে সিবিআই-কে যা কিছু তথ্যপ্রমাণ জোগানো সম্ভব সবটুকু দিয়ে এবং আমার ফলো-আপ রিপোর্ট লেখা শেষ করে মুম্বাইতে এসে পৌঁছোলাম। ঠিক করলাম জীবনযাপনকে একটা রুটিনের মধ্যে আনতে হবে।

কিন্তু ভাগ্য আমার জন্য অন্য কিছু নির্ধারন করে রেখেছিল। আমার রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অমিত শাহকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম কোন কর্মরত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রেপ্তার হলেন। চারদিকে আলোড়ন পড়ে গেল। অধিকাংশ জাতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরাই গান্ধীনগরে সিবিআই সদরদপ্তরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে শুরু করলেন। এই চাঞ্চল্যকর গ্রেপ্তারির পরবর্তী ঘটনাস্রোতের রিপোর্ট করার জন্য গুজরাটে ফিরতে হল আমাকে।

অনেক পুলিশ অফিসার বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছিলেন অমিত শাহের আমলে, শাহের গ্রেপ্তারি তাঁদের যেন নতুন জীবন দিল। এই সময় বিভিন্ন অফিসার আমাকে কৌশলে জানাতেন যে তাঁরা আমার সঙ্গে কথা

বলতে চান। আগে যাঁরা সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলতেন, এখন যেন তাঁরা কথা বলার শক্তি অর্জন করেছেন। অধিকাংশ কথোপকথনই ছিল ব্যক্তিগত, অফ দ্য রেকর্ড, কিন্তু সেটুকু থেকেই বোঝা যাচ্ছিল সংঘর্ষের ঘটনাগুলো হিমশৈলের চূড়ামাত্র। গুজরাটের বিভিন্ন ঘটনার ফাইলে আরও ভয়াবহ কিছু লুকিয়ে আছে। আমরা কেউই সত্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারিনি। বোঝা যাচ্ছিল বিগত এক দশকে বিচার ব্যবস্থাকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জিম্মাদাররা বিক্রি হয়ে গেছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সাজানো বন্দুকযুদ্ধ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক হত্যা পর্যন্ত বহু বিষয়ে বহু বেয়াড়া সত্য সামনে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু এগুলোকে প্রমান করার উপায় কি?

সাংবাদিকতার প্রথম কথাই হল প্রমাণ কিন্তু আমার হাতে শুধু কথোপকথন আর কিছু ঘটনার বিবরণ, অফ দ্য রেকর্ড স্বীকারোক্তি ছাড়া কোনো প্রমাণই ছিল না। এসব প্রমাণ করব কিভাবে? তখনই আমার জীবনকে পেশাগত ও ব্যক্তিগতভাবে পাল্টে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। রানা আইয়ুবের বদলে দেখা দেবে মৈথিলী ত্যাগী নামে কানপুরের এক কায়স্থ মেয়েকে যে 'আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউট কনজারভেটরি'র ছাত্রী। মৈথিলী দেশে ফিরে এসেছে গুজরাটের উন্নয়ন এবং সারা পৃথিবীতে নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা বিষয়ক সিনেমা বানানোর জন্য।